আশিকুর যখন বুকে গুলি নিয়ে হাসপাতালের আইসিইউতে গুয়ে আছে, তখন রাজীব চড়ে বসেছে অ্যাস্থলেশে। অনেক দিন পর বাড়ি ফিরছে ছেলেটা। এবার চিরবিশ্রাম। সেই ছোটবেলাকার মতো আবার মায়ের পাশে গুয়ে পড়বে ছেলেটা। তৃতীয় শ্রেণিতে থাকতে শেষ দেখেছিল মাকে-বাবাকে। এবার তাঁদের কবরের পাশে গুয়ে পড়বে। সন্তানকে মাঝে নিয়ে দুপাশে বাবা-মা। কী সুন্দর সুখী একটা ছবি! কিন্তু তা হওয়ার নয়। কারণ, সবাই তাঁরা অকালমূত। দারিদ্রের হুতাশন আর দুর্ঘটনা নামের কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডে যদি একটা পরিবার এভাবে শেষ হয়ে না যেত! ভাবা যাক, রাজীব ঢাকা শহরে মেসে থেকে বাসে ঝুলে টিউশনি করে একদিন বিসিএস দিয়ে সরকারি চাকরি পেল। ভাবা যাক, সেই সামান্য সফলতা নিয়ে সে গিয়ে দাঁড়াল তার বাবা-মায়ের কবরের সামনে। ছোট দুই ভাইকে পাশে নিয়ে সে তাঁদের কবর জিয়ারত করছে আর মনে মনে ভাবছে, যাক, ওপার থেকে বাবা-মা বোধ হয় তাকে আশীর্বাদ করছেন। ছেলের সাফল্যে তাঁদের বিদেহী আত্মা বোধ হয় এবার একটু জুড়াল।

কিন্তু সেই দৃশ্য আর জন্মাবে না; বরং কাটা পড়া হাতটা ঢাকা শহরে ফেলে রেখেই পটুয়াখালীর বাউফলের দাসপাড়া গ্রামে ফিরে যাচ্ছে রাজীব। এই শহর তার হাত নিল, প্রাণ নিল। দরিদ্র কোটায় আটকে পড়া ছেলেটার আশৈশবের সব সংগ্রাম ব্যর্থ করে দিল। নিজের পায়ে দাঁড়াতে ছুটে চলেছিল সে। তিতুমীর কলেজে স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার পাশাপাশি কম্পিউটার কম্পোজ, গ্রাফিকস ডিজাইনের কাজ শিখছিল। ছাত্র পড়াত। দম ফেলার ফুরসত ছিল না। ভাই দুটির দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। হয়তো নিজের করে একটা স্বপ্নও ছিল। সব শেষ।

হুমায়ূন আহহমেদ এই নিম্নবিত্তের মৃদু মানুষদের সুখ-দুঃখের অরূপকথার খবর রাখতেন। মুক্তিযুদ্ধে বাবাকে হারানোর পর, সরকারি নিপীড়নে বাড়ি হারানোর পর তিনি নিজেও কাটিয়েছিলেন অসম্ভব দারিদ্রোর এক যৌবন। তিনিই এঁদের মনের কথা লিখেছিলেন, □আজন্ম সলজ্জ সাধ, একদিন আকাশে কিছু ফানুস উড়াই□। কথাটা কাব্যিক শোনায়, কিন্তু এই কাব্যের জন্ম দুঃখের নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগারে। এমন কোনো স্বপ্ন যুবকেরা হৃদয়ে পুষে রাখবেই। রাজীবেরও হয়তো এমন কোনো সলজ্জ সাধ ছিল। তাই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে অভিমান করে কাটা হাতের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, □রাজীব কে? রাজীব মারা গেছে!

-, , , , , , , , ? -? !